International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 2800)
Volume-III, Issue-VI, May 2017, Page No. 12-21
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

সুরমা গাঙর পানি : মননে লোকঐতিহ্য অন্বেষণে দেশ

ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত

Abstract

Ranabir Purkayastha one of the eminent short story writer of North-East India. He wrote so many short stories. 'Surma Gangor Pani' one and only novel written by Ranbir Purkaystha in the year 2012.

Main theme of this novel 'Surma Ganger Pani is' Partition. In 1947 India got independence, but is divided. One is Hindusthan another is Pakisthan. For that reason so many people fall in trouble. So many people be some Refuge they lost their identity mainly in East Bangla & Punjab prominence.

In this context some novel was written by eminent Bengali writer in west Bengal. But in north-east India it is rare. In the year 2014 the novel 'Bindu Bindu jol' was written by Shekor Das in this content. After Shekor das we don't get any novel in this context. In the year 2012 Ranabir Purkayastha wrote 'Surma Gangor Pani'. In our research article we analysis that period. How Ranbir Purkayastha find out the real picture of Purba Bangla during the partition. Surma Ganger pani is a real story of Partition and Refugee life. We discuss thoroughly about, in this article.

(১)

উত্তরপূর্ব ভারতের আধুনিক বাংলা গল্পবিশ্বে রণবীর পুরকায়স্থ এক সুপরিচিত নাম। দক্ষিণ আসামের বরাক উপত্যকার 'শতক্রতু' গল্প আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ রণবীর পুরকায়স্থের জন্ম ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে করিমগঞ্জ জেলার লালখিরা চা-বাগানে। কর্মজীবনে তিনি ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কর্মচারী ছিলেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। ইতিমধ্যে তাঁর কয়েকখানা গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো হল, 'বোকা কাশীরাম কথা, 'তৃতীয় ভুবনের রূপকথা', 'আসমান জমিন কথা', 'শিকড়ের সন্ধানে' ইত্যাদি। 'সুরমা গাঙর পানি' (২০১২) তাঁর একমাত্র উপন্যাস। এই উপন্যাসে অনবদ্য মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন রণবীর পুরকায়স্থ। লোকায়ত জীবন ও দেশভাগ নিয়ে দেশজ রীতিতে 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসে যে বয়ান উপস্থাপিত করেছেন রণবীর পুরকায়স্থ তা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা সাহিত্যে এক নবদিগন্তের বার্তাবহ। দীপ্তেন্দু দাসের একটি বয়ান প্রাসঙ্গিক বোধে উদ্ধৃত হল—

> *"দেশভাগের ছটি দশক কেটে যাবার পর বাঙালি ধীরে ধীরে সাহিত্যে দেশভাগ উপস্থাপনা করার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছে। দুর্দান্ত সাফল্য এখনও আসেনি নিশ্চয়ই। কিন্তু শুধু মুখ ফিরিয়ে দায় এড়ানোর প্রয়াস নয়, বা রূঢ় বাস্তব থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা নয়, বরং সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাস্তব স্বীকার করে নিয়ে পেছন ফিরে তাকানোর সাহস বোধহয় বাঙালি এতদিনে সঞ্চয় করতে পেরেছে। দেশভাগের মতো একটা বিষয় মন্থন করলে অনেক গরল বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা আছে জেনেও সে আজ যন্ত্রণাক্লীষ্ঠ অতীত ফিরে দেখতে অস্বস্তি পাচ্ছে না, এ নিঃসন্দেহে এক বড় কথা।"*[১]

এই যন্ত্রণাক্লীষ্ঠ অতীত খুঁড়ে তুলে এনেছেন ঔপন্যাসিক রণবীর পুরকায়স্থ। 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসের চিন্তাবীজ কীভাবে তৈরী হয়েছিল উপন্যাসের শুরুতে 'কথার কথা' অংশে তিনি তা উল্লেখ করেছেন—

> *"আখ্যানের জলবায়ু রয়েছে যে পরদেশে, আমার সেই উৎস ভূমিতে গিয়েছি বছর দুয়েক আগে, দীন যথা যায় দূর তীর্থদর্শনে। খুঁজে পেয়েছি আমার পিতৃভূমি। পৌঢ়বেলায় কোন্ যাদুবলে জেগে উঠল আমার সাংস্কৃতিক জন্মের প্রথম শুভক্ষণ! শিকড়ে জলের ঘ্রাণ পেলাম এই প্রথম। নিজের অজ্ঞাতসারেই বৈতল নামের কোন এক সম্ভাব্য সত্তার ভ্রূণ জন্ম নিল। সুনামগঞ্জ-সিলেট এর আলো-হাওয়া-রোদ শুষে নিয়ে মনের ভেতরে আখ্যানবীজ জেগে উঠতে থাকল ক্রমশ। যে দেশভাগ এতদিন তথ্যমাত্র ছিল, এবার তা মর্মবিদারক সত্য হয়ে উঠল।"* [২]

'সুরমা গাঙর পানি' মর্মবিদারক সত্যের আখ্যান, কোন কপটতা নয় সাবলীলভাবে ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন দেশভাগ, দেশভাগ জনিত উদ্‌বাস্তু জীবন, লোকজ দেশীয় রীতিতে আঞ্চলিক লোকায়ত জীবনও রাজনৈতিক জীবনের টানাপোড়নে 'সুরমা গাঙর পানি'র আখ্যান তৈরী হয়েছে। দীপ্তেন্দু দাসের আরও একটি বয়ান প্রাসঙ্গিক বোধে উদ্ধৃত হল—

> *"স্বাধীনোত্তর কয়েক দশক অবধি উত্তর-পূর্বের বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত আখ্যান সাহিত্যে, কলকাতা-মুখিনতা লক্ষ করা যায়। ভারতের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা কেন্দ্রীকতার প্রভাব থেকে এখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত তা নয়। তবে দুই বাংলার কেন্দ্র থেকে ভৌগোলিক দূরত্বে অবস্থানের সূত্রে, ভারতভূমির উত্তর পূর্বের পরিধিতে অবস্থিত এই ভুবন আশির দশক থেকে, আখ্যান সাহিত্যে বিশেষত, নিজস্ব সমস্যা উদ্ভূত বিষয় নির্বাচন ও আঞ্চলিক ভাষার শৈল্পিক প্রয়োগের মাধ্যমে, একটা আলাদা চরিত্র গড়ে তুলতে পেরেছে, যা কিনা বাংলা সাহিত্যের দুই কেন্দ্র থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। এতে পল্লবিত হয়েছে সাহিত্য-বৈচিত্র্যে ভরে উঠেছে তার ভাণ্ডার।"* [৩]

আঞ্চলিক সিলেটি ভাষার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসে। আঞ্চলিক ভাষার শৈল্পিক প্রয়োগে উপন্যাস হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে জীবন্ত। আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগের একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হল—

> *"—তর লগে ইতা অইত নায়। অইলে ত হিদিন অউ অই গেল নে ইস্পার উস্পার। মারি লিলাম নে হিদিন। আমিও খিত্তার বাঙাল। আমারও নাকর আগাত জুলফুকার।*
> *-- আমি ও অলাখান। মাল পাইলেই ঝাড়ি দেই। আমি কিতা কেউ জানে না। যে যেলা পারে কয়। বৈতল দাস, বৈতল পাটনি, বৈতল উঝা, কছ না বেটা বৈতল মিয়া। আমার কিতা।"*[৪]

নিখুঁত ভাষার প্রয়োগ, কোথাও কোন জড়তা নেই। এভাষা ছাড়া বৈতল বৈতল হয়ে উঠত না।

(২)

আখ্যানের ব্যবচ্ছেদ :

'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসে সর্বমোট ৬৪টি পরিচ্ছেদ রয়েছে প্রথম এক থেকে বাইশটি পরিচ্ছেদের কোন নাম নেই। বাইশ নং অনুচ্ছেদের পর আবার নতুন করে শুরু হয় 'উজান পর্ব'। এই পর্বে রয়েছে মোট ৪২টি পরিচ্ছেদ। প্রথম বাইশটি অনুচ্ছেদ রয়েছে সিলেটের কথা, দেশভাগের আগের সিলেটের প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছে। শেষের ৪২টি পরিচ্ছেদে রয়েছে উদ্বাস্তু জীবন আর দেশের স্মৃতি।

প্রথম অংশে অর্থাৎ উজান পর্বের আগে ঘটনা প্রবাহ আবর্তিত হয়েছে বৈতল-লুলা-বৈতলের মা-বাবা গুরু সৃষ্টিধর ওঝা, তার পাঁচ কন্যা, এদের মধ্যে--দেশভাগ পূর্ববর্তী বৈতলের জীবনের প্রথম পর্ব। উজান পর্ব থেকে শুরু হয় বৈতলের জীবনের ২য় পর্ব। বন্ধু লুলাকে মেরে পিয়ানের জলে ভাসিয়ে সুরমার উজানে বরাকের তীরবর্তী কাছাড়ে চলে এসেছে বৈতল। এই পর্বে ঘটনা প্রবাহিত হয়েছে বৈতল-দুর্গাবতী নতুন বন্ধু দুখু-বছই- আপদ, জমিদার যমুনা প্রসাদ সিং,মামু পীর, সাজিদ মিয়া এদের মধ্যে। তাদের আলাপ-চারিতায়, ঘটনা প্রসঙ্গে এসেছে দেশের স্মৃতি যন্ত্রণা আর লোকায়ত জীবন ভাবনা।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বৈতল, ৬৪টি পরিচ্ছেদের সবকটি জুড়ে রয়েছে বৈতল। বৈতল আপাত তুচ্ছ কৈবর্ত সমাজের লোকায়ত মানুষ। বৈতল তো কোন নাম নয় গাইল। বৈতল মানে অপভাষা (slang language)। বৈতল নিজেও তা স্বীকার করে-

"—লগর ইগু কিগু।
-- বৈতল।
-- বৈতল ত গাইল।
-- অয় গাইল।" [৫]

দেশভাগের বলি হতে হয় সাধারণ খেটে খাওয়া মাটির কাছাকাছি মানুষের যে মানুষ জানেই না 'দেশ' আসলে কি? বৈতল তার গুরু সৃষ্টিধর সূত্রধরকে প্রশ্ন করে –

"ঠাকুর দেশ কিতা?[৬]

অর্ধশিক্ষিত কাঠমিস্ত্রি গুরুর উত্তর—

> *"ভালা কতা কইলায় বাবা। কিতা কইতাম কও চাইন। দেশ অইল, ঝুঝছনি, এক ঝাণ্ডা। বদমাশির জয় পতাকা। দেখিয়া ডরাইতা।"*[৭]

মাটির কাছাকাছি মানুষ বৈতল। জলের দৈত্য বৈতল। জলই তার জীবন। মাছ ধরা তার জীবিকা। ভাটিয়ালির সিলেট তার প্রিয় জায়গা। সিলেটের বইয়াখাউরির হাওর-বিল তার স্বপ্নজগৎ। বন্ধু লুলাকে নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে তার স্বপ্ন জগতে। মন্দির-মসজিদ-মাজার কবরে অনায়াস যাতায়াত। 'সিদল ভর্তা' তার প্রিয় খাবার। পদ্মা পুরাণের ওঝা গান তার প্রিয়। ওঝার গান শেখার জন্য সে বন্ধুকে নিয়ে নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শেষে বন্ধু নুলা তাকে নিয়ে গেছে রইদপুয়ানিতে ছঁতোর মিস্ত্রী সৃষ্ট ধর সূত্রধরের বাড়িতে। গুরুর কাছে সে পদ্মপুরাণ গান শিখেছে। লোকায়ত জীবনের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ। এই জীবন থেকে একদিন তাকে উৎখাত হতে হয় রাজনৈতিক চক্রান্তে। সুরমা গাঙর উজানে কাছাড়ের শিলচরে সে এসেছে দুর্গাবতীকে নিয়ে। বেঁচে থাকার জন্য দুর্গাবতীর 'শর্মা' পদবী সে গ্রহণ করেছে। উদবাস্তু জীবন তার ভাল লাগে না, সে ফিরে যেতে চায় তার স্বপ্নের জগতে। তার ফেলে আসা অতীতে বইয়াখাউরীতে। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের চক্রান্তে তা তো সম্ভব নয়। বৈতল পেশা নানা

গ্রহণ করেছে কিন্তু কোন পেশাতেই মন লাগাতে পারেনি। কেননা 'তার অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' খেলা করে জল। জলের দৈত্য বৈতল। জল ছাড়া বৈতলের কোন শক্তি নেই। মাইমল বৈতলকে মাছমারা যতটুকু আনন্দ দেয় রিক্সাচালানো ততটুকু আনন্দ দেয় না।

লোকায়ত পল্লী জীবন তার অনাবিল আনন্দের জগত, সারাটা জীবন সেই আনন্দের রেশ টেনে বৈতল বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। বার বার ফিরে যেতে চেয়েছে লোকায়ত জগতে কিন্তু দুর্গাবতীর জন্য তার যাওয়া হয়ে উঠে না। উপন্যাসের শেষে বৈতল বদ্ধজীবন থেকে এক অজানার উদ্দেশে দুর্গাবতীর হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছে—

"দুজনের বুকে দুই পাঁজর বেঁধে আবার চলে, নতুন রিফিউজি
কলার ভেলায় করে যাত্রা। ষাট ইংরেজির বন্যায় ভেসে চলে আর এক অজানার উদ্দেশ্যে। ..."
'নতুন বসতি গড়তে বৈতলের ভেলা চলে দুলে দুলে।'[৮]

সমাজ বাস্তবতা :

সিলেট কাছাড়ের সমাজচিত্রের এক সুন্দর আলেখ্য ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। 'সিদল' সিলেটি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উপন্যাসে বার বার এসেছে সিদলের কথা। উপন্যাসের শুরুতে সিদলের কথা আছে—

"মা খেতে দেয় সিদল পোড়া পান্তাভাত আর মরিচবাটা। লাল রঙের লঙ্কাবাটা দেখলেই বাপের চোখ খুশিতে চকচক করে। বলে পুটকি পুড়া ঝাল না অইলে আর কিওর হিদল পুড়া।"[৯]

হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সিলেটি মানুষের প্রিয় খাবার 'হিদল' বৈতল তার মুসলমান বন্ধু লুলাকে বলেছে—

"বইয়াখাউরিতও মা আছে। চল, তুই হিদল ভর্তা খাছনি।
-- ভর্তা উর্তা কে বানাই খাওয়াইত। পুড়িয়া খাই লাই এক বর্তন ভাত
-আমার মার আতে খাইবে। অমৃত লাগবে। চাটবে।" [১০]

সিদল প্রসঙ্গ বার বার এসেছে ঔপন্যাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গে। প্রথম বার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর বৈতল আবার যখন ফিরে আসে তখন বৈতলের বাবা মনের আনন্দে বৈতলের মাকে বলে—

"এক পুয়ার বাপ অনেকদিন পর ছেলেকে কাছে পেয়ে ভুলে যায় সব। মাকে বলে, -- আইজ হিদল পুড়া আর ভাত। ঠাসিয়া দিছ মরিচ। ঝালের মুখে জিভের চকাশ চকাশ আনন্দে মায়ের চোখও চিকচিক করে।" [১১]

দেশ ভেদে মানুষের খাদ্যাভাস আলাদা। দেশে দেশে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খাবার আলাদা আলাদা পরিচয় রয়েছে, সিলেটি সম্প্রদায়ের সিদল। সিদল তৈরি করার কায়দাও অভিনব—

"বৈতল বাপের সঙ্গে সিদল দেয়। হাওরের বড় বড় পুঁটির শুটকি সাজিয়ে রাখে মাটির কলসিতে।
পরতের পর পরত সাজিয়ে দেয় শুকনো মাছ। মাছের পেট থেকে তেল বের করে রেখেছে বাপ।
সিদল দেওয়ার সময় আবার তেল মাখায়। হাঁড়ির মুখ চুন শুকনো লতা পাতা দিয়ে বন্ধ করে।
রান্না ঘরের নিচে মাটিতে পুঁতে রাখে আঘন মাসের জন্য।
অগ্রহায়ণ মাসের নতুন সিদল আর পান্তাভাতে শরীর বাড়ে দুরন্ত।"[১২]

সিলেটি লোক জীবনের সঙ্গে সিদলের যোগ ওতপ্রোত। সিলেট অঞ্চলের সমাজ বাস্তবতার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসে। উপন্যাসে বার বার সিদল প্রসঙ্গ এসেছে।

সিলেটি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে 'পদ্মপুরাণ' বা মনসামঙ্গল গান ওতপ্রোত ছড়িয়ে রয়েছে। পদ্মপুরাণ গান সিলেটি লোকঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাইতো বৈতল পদ্মপুরাণের ওঝা নৃত্য শেখার জন্য স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছে। বৈতল বন্ধু লুলাকে বলেছে তাকে অক্ষর শিখিয়ে দেবার জন্য যাতে সে মনসা 'পুঁথি' পড়া শিখতে পারে।

"মায় কইছলা উঝা বানাইবা। কইছলা তর অত বালা গলা, নাচতেও পারছ দেখছি শ্রাবণীর সময়। আমরাও খুব হাউশ জানছনি। লেখা পড়া না জানলে ইতা হয়। লেখাপড়া কেমনে শিখতাম ক চাইন।
--অখন আর পারতে নায়
--পারমু। তুই শিখাই দিবে। অ আ তো জানি। নাম লেখতাম পারি।
--আমিও তো জজ মেজিস্টর। হিন্দু বাড়ি থাকিয়া আমিও অ অক্ষর শিখছি।
--অইব। এতেউ অইব। আমি পুঁথি গাওয়া শিখতাম।"[১৩]

পুঁথি গাওয়া শেখার এ এক আবেগ। এই আবেগ থেকে বৈতল লেখা পড়া শিখতে চায়। লুলা বৈতলকে নিয়ে যায় ছুতোর মিস্ত্রি সৃষ্টিধর সূত্রধরের বাড়ি। সেজন্য ওদের বন্ধুত্বের মাঝে বিচ্ছেদের জলবিভাজন তৈরী হয়। লেখকের বয়ানে—

"কীজানি কোন অভিমানে কৃষ্ণ সুদামার বিচ্ছেদ হয়ে যায়। দুজনেই ভেতরে ভেতরে ভেঙে খান খান। বন্ধুত্বের অভ্যাস ছাড়তে বড় কষ্ট। কিন্তু মচকাবে না কেউ। তাই দুপথে দুজন।"[১৪]

পুঁথি পড়া শিখতে বৈতল বদ্ধপরিকর—

"মাছুয়া বৈতল এখন নিজেকে তৈরী করতে চায়। তার মার ইচ্ছা পূরণ করতে চায়, পুঁথি পড়া শিখতে চায়। লুলাকে বৈতল বলেছিল বিয়ানিবাজারের চৈতন্য চরণ পাল-এর কথা, বাংলায় নাকি জেলায় জেলায় মনসা পুঁথির রচয়িতা আছেন। চৈতন্য চরণ তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"[১৫]

বৈতল সৃষ্টিধর সূত্রধরের বাড়ি প্রথমবার গেছে, সৃষ্টিধরকে দেখে তার মনে হয়েছে তিনি চৈতন্য চরণ পাল-

"বইয়াখাউরির বৈতল উত্তেজনায় সরাসরি কাঠমিস্ত্রিকে প্রশ্ন করে - আপনি চৈতন্যচরণ পাল নি।"...
মনের ভিতর তখন বড় হাওরের উথাল পাথাল জলের ঢেউ। কান্না, বৈতলের কান্না কেউ দেখতে পায় না। শুকনো চোখে একবার হাত বুলিয়ে সেই হাত দিয়ে নাম পরিচয় অজানা পুরুষের পায়ে প্রণাম করে। বলে—

-আপনি আমার গুরু ঠাকুর অইবা নি। আমি নাচ শিখতাম, গান গাইতাম। বিষরির গান, জিয়ানি ঢলানি।"[১৬]

পদ্মা পুরাণ গানের প্রসঙ্গ নানা সময়ে নানা ভাবে উপন্যাসের বয়ানে ফিরে ফিরে এসেছে। বৈতল হয়েছে বৈতল ওঝা, গুরু সৃষ্টি ধরের সঙ্গে থেকে ওঝা নৃত্য বেশ শিখেছে। কাছাড়ের হরিৎবরণ ইটখোলা জমিদারের বাড়িতে সে মনসা পুজার গান গেয়েছে, এই গান তার কাছে এক চ্যালেঞ্জ, নিজেকে প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ—

"বৈতলের আইগানে বিভোর জমিদার হাসে। পুঁথিগায়ক বৈতলের গান শুনতে হরিৎবরণ ইটখোলা দুধপাতিল থেকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ এসে জড়ো হয় গুরমির বেশে নাচে বৈতল।বৈতলের গাল শুশ্রুবিহীন শ্যাম। কিম্পুরুষ নাচের আদর্শ। বৈতলের কণ্ঠেও পদ্মাবতীর বাস। অধিবাসের দিন বৈতল একটু আনমনা হয়। উত্তেজনায় দুর্ভাবনা ও হয়, পারবে তো। একক গানে উৎরে যাবে তো। গুরু সৃষ্টিধরকে স্মরণ করে গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুরদেব মহেশ্বরো, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে গুরুকে, নির্দ্বিধায় নিজের নাম

উচ্চারণ করে গুরুর নামে। নবীন গায়ক সৃষ্টিধর ওঝার পুনর্জন্ম হয় হরিৎবরণ মনসামন্দিরে। গুরুর মত নির্ভর করে নিজেকে। ভুলে যায় ঘর সংসার। শুরু করে গান। শ্লোক দিয়ে হয় মঙ্গলাচরণ।"[১৭]

পদ্মাপুরাণ পুঁথি পাঠ সিলেটের লোকজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তারই প্রতিফলন ঘটেছে 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসে। আঞ্চলিকতার দাবী মেনে এই উপন্যাসে পুঁথি পাঠের প্রসঙ্গ এসেছে। একটি অঞ্চল তার সামগ্রিকতা নিয়ে ধরা পড়েছে।

সামাজিক জীবনের সম্প্রতি, দ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাত এ সমস্ত কিছুই উদ্ভাসিত হয়েছে উপন্যাসে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে সিলেটের সামাজিক পরিসর ছিল সৌহার্দ পূর্ণ। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রতি ছিল, ধীরে ধীরে স্বাধীন পাকিস্তানের স্বপ্নে বিভোর মুসলিম লিগ সিলেটের সমাজ জীবনে সম্প্রতির ভাবাকাশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দিতে শুরু করল, তখন মুসলমান আরো মুসলমান, হিন্দু আরো হিন্দু হয়ে উঠতে লাগল। তাতে করে এক সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরী হয়।

সামাজিক সম্প্রতির এক সুন্দর চিত্র ঔপন্যাসিক উপস্থাপন করেছেন রুল আমিন বেজ ওরফে নুলা এবং বৈতলের বন্ধুত্বের সম্পর্কে। পিতৃ-মাতৃ হারা নুলাকে বৈতল তার মার কাছে আসার প্রস্তাব দেয়, ঔপন্যাসিকের বয়ানে—

"কিছুই নেই যার, সে যা আছে তার ভাগ দিতে চায় না কাউকে। কিন্তু বৈতল দেয়। মুখে আমার মা আমার মা করলেও মায়ের ভাগ দেয় মাতৃহীন বান্ধবকে।
বৈতলেরও এক সুহৃদয় হয়েছে দেখে মাও খুব খুশি। বলে
-রাম জন্মাইতে রইম আর লুলা জন্মাইতে বৈতল। ছাড়াছাড়ি অইছ না বেটা।"[১৮]

হিন্দু-মুসলিমের কোন ভেদাভেদ ছিল না। বৈতল হিন্দু, লুলা মুসলমান তারপরও ওদের বন্ধুত্ব মানিকজোড়। ওরা দু'জন ঘুরে বেড়িয়েছে কখনও মন্দিরে থেকেছে রুল আমিন বেগ লুলা দাস নাম নিয়ে কখনও বৈতল থেকেছে মসজিদে বৈতল মিঞা নাম নিয়ে। কোন সমস্যা হয়নি কোনদিন।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের আরো ছবি পাওয়া যায় উপন্যাসের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে, আত্মবিশ্লেষণের ভঙ্গিতে বৈতল বলেছে—

"—আরো ছুট আছলাম। তখন কিগু হিন্দু আর কিগু বাঙাল বুঝতাম না। ধুমধুমাইয়া বাঙাল বাড়িত ঢুকি গেছি। মুরগির ছালইন খাইছি। গরুউরু কেউ খাওয়াইছে না। আর খাওয়াইলেউ কিতা। ঈদগাততো খেলতাম অউ। মজিদও গেছি। পাটনি বাড়ি মাইমল বাড়ি আলাদা আছিল না। অখন মন বদলি গেছে, আল্লা আলাদা অই গেছইন। তান নাম শুনলেউ গুসা উঠে।"[১৯]

স্বাধীনতা যত এগিয়েছে মানুষের মধ্যে বিভাজন রেখা ততই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবিশ্বাস হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে ক্রমশ সন্দেহের ঘূর্ণাবর্তে ফেলে দিল - মুসলীম লিগের কুটিলতায় সাধারণ মানুষের মনও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে ভরে উঠতে থাকে ক্রমশ, বৈতল ও লুলার কথাবার্তায় তা পরিস্কার হয়ে উঠে—

"হিন্দু বাঙাল মিলাইলে মানুষে কল্লা লামাই দিবা। এখন আর হিদিন নাই।"[২০]

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে যে জটিল আবর্ত তৈরী হচ্ছে তার পূর্বাভাস এই বয়ানে পরিলক্ষিত হয়। বৈতলের বাবার সঙ্গে বৈতলের কথোপকথনেও এ বিষয়টা আরো পরিস্কার হয়ে উঠে—

"—ইতা বাদ দেও, কও লুলারে থাকতে দিলায় না কেনে।
--কেনে দিতাম বাঙাল ইগুরে। আমার বাড়ি।

--তুমার বাড়ি কিতা, আমারও বাড়ি। হিগু থাকব
---ঢুকাইলাছ না, ইতায় অখন সব হিন্দুর বাড়ি নের গি ভুলাই ভালাই। সব বলে বাঙালর অই যাইব।" [২১]

হিন্দু-মুসলমানের মধ্য একদিন যে সম্পর্ক ছিল শরৎকালের কাশফুলের সৌন্দর্যে ভরপুর সেই সম্পর্ক ধীরে ধীরে লোভ আর বিদ্বেষে কালো হয়ে উঠতে লাগল। এ প্রসঙ্গে প্রদীপ সরকারের স্মৃতিচারণ মূলক একটি বয়ান প্রাসঙ্গিক বোধে উদ্বৃত হল—

"ইহজগত ত্যাগ করার মতো। বাড়িতে শোকের ছায়া। সকাল-সন্ধ্যা ভিড়। আর সেই ভিড়ের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। একদলের চোখে লোভের চকচকে দৃষ্টি আর একদলের অশ্রুসজল চোখ। তাদের দুঃশ্চিন্তা, অসুখে-বিসুখে শেষ ভরসাটাও রইল না। বাকিদের তর সইছে না। রীতিমতো হুড়োহুড়ি। যেন নিলামের বাজার। কার আগে কে মূল্যবান সামগ্রীটি হাত করবে। প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো নায়ের-বাড়ি। মূল্যবান সামগ্রীর তো অভাব নেই। কেউ তামা-কাঁসার বাসন, কেউ আসবাব পত্র ধরে টানছে, তো কেউ বহু যত্নে পোষা দীর্ঘদিনের গবাধিপশুর দড়ি ধরে টানাটানি জুড়েছে। রীতিমত দক্ষযজ্ঞ। মা দাওয়ায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দরদর করে চোখের জল ফেলেছেন।"[২২]

সময়ের সাথে সাথে বৈতলের একান্ত প্রিয় বন্ধু নুলা বদলে যেতে থাকে এবং বদলেও যায় সে সাচ্চা মুসলমান হয়ে উঠে-

"ঘুম ভাঙে লুলার গালাগালিতে। অকথ্য চিৎকারে লুলা বৈতলের গায়ে লাথি মারে। বৈতল ওঠে। এত বড় সাহস তার। ভাল করে তাকায় ঘাতকের দিকে। চিনতে পারে না লুলাকে। এই কি তার প্রাণের বন্ধু রুল আমিন শেখ। দেখে লুলার থুতনিতে পেয়াজের জড়ের মতো কালো এক মুঠো দাড়ি। বৈতল ভাবে লুলা ঠাট্টা করছে, আবার কোনো দুষ্ট পরিকল্পনা আছে, আবার বেরোবে কোথাও। বৈতলকে বলবে 'চল'। বৈতলও বেরিয়ে পড়বে। বৈতল তাই হাসি মুখে লুলার দাড়ি নেড়ে দেয়। বলে...

--তুই আকতা দাড়ি রাখলে কিতা।
--দাড়ি রাখন লাগে। ইমানদার মুসলমান অইলে রাখন লাগে। তুইও রাখবে।
--আমার দাড়ি উঠে না।
--ইখানো থাকলে উঠানি লাগব
--অই হালার হালা, তুই মন্দিরো ঢুকলে কেমনে।
--অখন মন্দির উন্দির কিচ্ছু নাই।
--কেনে।
--ইনো আমরার মজিদ আছিল, কাফির হকলে মন্দির বানাইছিল মোল্লার ভিটাত।
আমরা আবার আজান দিমু ইনথনে।"[২৩]

রাজিনীতির মারপ্যাঁচ মানুষের সম্পর্কের ভিত নাড়িয়ে দেয়। ধর্মের রাজনীতি মানুষকে অমানুষ করে তুলে, যে লুলা অর্থাৎ রুল আমিন বেজ কোনো মেয়ের দিকে তাকাত না কোনো দিন সেই লুলা একের পর এক হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করতে থাকে ঔপন্যাসিকের বয়ানে—

"সেই বন্ধুও বদলে যায়। পাকিস্তান হওয়ার পর ধীরে ধীরে পাল্টে যায় লুলা। হয়তো দেশের জন্য ধর্মের জন্য কোনও কাজ পেয়ে যায়। লুলাও হয়তো ভাবে এক ধর্মরাজ্য গড়তে হবে। সব বাধা দূর করতে হবে। দলে দলে যারা দেশ ছেড়ে যায় তারা তো যায়। যারা মাটি আঁকড়ে থাকতে চায়, তাদের কথা ভাবে লুলা। ওদেরও তাড়াতে হবে। কিংবা ধর্মান্তরিত করতে হবে"।...[২৪]

বৈতলের প্রতিবেশীরা বৈতলকে বলে-

"-- বৈতল, তুই কিন্তু দাড়াইশ সাপর লগে ঘর কররে।
-- কেনে, কিতা অইছে...
-- কিতা অইছে কও, ইতা জানি
-- তুই জানছ না, হে যে হিন্দুর বৌ বেটি হক্কলর ইজ্জত লুটের।" [২৫]

এ প্রসঙ্গে সমরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী স্মৃতিচারণ মূলক একটি বক্তব্য প্রাসঙ্গিক বোধে উদ্বৃত হল—

"...অত্যাচার সর্বগ্রাসী রূপ নিল। যাহারা ধনবান ছিল তাহারা ধন হারাইতে লাগিল। যাদের ঘরে যুবতী মেয়ে, বউ আছে, তাহারা প্রতি মুহূর্তে উৎকণ্ঠায় রহিল। এছাড়া ধর্মান্তকরণের একটা উল্লাস আছে। সব কিছু মিলাইয়া দেখিলে মনে হইবে একটা নারকীয় ব্যাপার।"[২৬]

এই সমাজ বাস্তবতারই প্রতিফলন ঘটেছে 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসে।

(৩)

লুলা ওরফে রুল আমিন বেজ অগ্রদানী ব্রাহ্মণের মেয়ে দুর্গাবতীকে জোর করে ধর্ষণ করতে এলে প্রিয় বন্ধু লুলাকে মেরে পিয়ানের জলে ফেলে দেয় বৈতল। বৈতলের তখন গভীর মর্ম যন্ত্রণা -

" -- যা দোস্ত! মাটি দিতাম পারলাম না, পানি দিলাম এক আইজলা। লুলার শেখানো মন্ত্র উচ্চারণ করে 'বিসমিল্লার রাহমানির রহিম'। দুর্গাবতীর বাপ ভুড়ুৎ ঠাকুরকে দেখেছে মরার উপর জল ছিটিয়ে বলতে 'পবিত্রোপবিত্রবা'। বৈতলও বলে ,
-- পবিত্রোপবিত্রবা।
আরবি কথা কিংবা সংস্কৃত কথার অর্থ জানে না বৈতল। বৈতল জানে শুধু সদগতি। বন্ধু যেখানেই থাকুক শান্তিতে থাকুক।[২৭]

দুর্গাকে নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাত ধরে কলার ভেলা ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়ে বৈতল গন্তব্য হিন্দুস্থান। বৈতল সুরমার উজানে বরাকের তীরবর্তী কাছাড়ের উদবাস্ত শিবিরে চলে আসে। নুতন দেশে নতুন জীবনের সন্ধান করতে থাকে। নতুন নতুন জীবিকা নিলেও তার মনে থেকে যায় সিলেটের ফেলে আসা লোকায়ত জীবন। বাঁচার জন্য জাত কৈবর্ত বৈতল স্ত্রী দুর্গার পদবী শর্মা গ্রহণ করে নিজের নাম্ রাখে সৃষ্টিধর শর্মা।বৈতল হয়ে যায় ব্রাহ্মণ। এই পদবী তাকে তৃপ্তি দেয় না। এ বৈতলের বাহিরের আভরণ। দুর্গার সঙ্গে এক সাময়িক বোঝাপড়া। মনে প্রাণে সে মাইমল কৈবর্ত। জলের দৈত্য বৈতল জলই তার জীবন। দুর্গাবতী তাকে মাছ মারতে যেতে দেয় না-

-- 'বৈতলের মাছ মারা নিয়ে তার আপত্তি। বলে
-- তুমি মাছ মারাত গেলেউ গাত মাইমালি গন্ধ অই যায়।'[২৮]

বৈতল তখন নির্দ্বিধায় বলে –

'আমি তো মাইমল অউ বেটি। বৈতল দাস পাটনি। গন্ধ ত থাকবউ।[২৯]

লোকায়ত জীবনই তার আসল পরিচয়, তার চারন ভূমি।

ফেলে আসা দেশকে সারাজীবন অন্বেষণ করে বৈতল। যে দেশ সুরমা-পিয়ানের দেশ, যে দেশ অসংখ্য নদী হাওরের দেশ, যে দেশ জলের দেশ,যে দেশে লুলার মত সুহৃদ রয়েছে সেই দেশ। ভৌগোলিক ভাবে পৃথক হয়ে যাবার পরও স্মৃতিতে সারাজীবন খুঁজে বেড়িয়েছে সেই দেশকে। বার বার সে ফিরে যেতে চেয়েছে তার দেশে-

- 'আমি যাইমুগি।
- কই যাইতায়।
- আমি আবার বইয়াখাউরি যাইমুগি।জৈন্তার পাড়ো ঘুরমু, পিয়াইনর পানিত খেপ মারমু। আমার আর ইতা ভালা লাগেরনা।"[৩০]

দেশকে অন্বেষণ করতে করতে বৈতলের মত একজন সাধারণ মানুষের বিরক্তি এসে যায়, কষ্ট পায় মনে। মানুষ জন্মের প্রতি তার অশ্রদ্ধা চলে আসে,সে তখন ভাবতে বাধ্য হয়-

> *"বৈতলের পরাণ বার বার মনোব্যথায় গুমোট। ভাবে, এ কেমন মানুষ না পায়খানার গু। বাড়ির পায়খানা থেকে নাগা জমাদারনির মাথায়। মাথার টিন খালি করে আসে খাসিয়াপটির মাল গুদামে, গুদামের মাল আবার যায় গুয়ের গাড়িতে। কোথায় যায় কে জানে। তবে বৈতল জানে যেখানেই যায় দুর্গন্ধের অশ্রদ্ধায় যায়। বইয়াখাউরি থেকে গু-এর টিন হয়ে এল ইণ্ডিয়ায়, ইণ্ডিয়ায় এসেও উৎপাত কমে না, আবার কি যেতে হবে মালগুদামে বোঝাই হয়ে। শুনছে জল নেই দেশে নিয়ে যাবে, দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছে। লেখালেই কি যেতে হবে। কোথায় যাবে বৈতল। কত ঘুরবে,কথায় হবে তার শেষ আপন দেশ।"*[৩১]

'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাস আসলে এই দেশ অন্বষণের আখ্যান। বৈতল তো একক ব্যক্তি নয়, উদবাস্তু বর্গ মানুষের প্রতিনিধি। দেশভাগের সময় যারা উদ্‌বাস্তু হয়ে এসেছিল পিতৃ পুরুষের বাস্তু ভিটে, নিজের চেনা জগৎ, নিজের পাড়া- প্রতিবেশি, বন্ধু সজন ছেড়ে সুরমা গাঙর পানি তাদের আখ্যান। ঔপন্যাসিকের বয়ানে পাই-

> *"মোহনা থেকে উৎসে ফিরে যাওয়া যায় না। জল কি উজান বইতে পারে? তবু অন্তর্গত রক্তের কল্লোলে কী যেন এক ইচ্ছা জেগে থাকে। উৎসে বড় মায়া। সেই মায়াবী পর্দাকে ছুঁতে সাধ যায়।কোন সব পেয়েছির দেশ সেখানে? কোন এলডোরাডো! দেশভাগ দেখেছেন আমার মা-বাবা আমি দেখিনি। একটু বড় হয়ে শুনেছি, স্মৃতিহীন পরম্পরাহীন ভাঙা মানচিত্রের অবহেলিত ছিটমহলে থাকার যে-সুবিধা পেয়েছি- স্বাধীনতা এরে কয়।ছেলেবেলা থেকে স্রোতের শ্যাওলা হয়ে ভেসে বেড়েয়েছি। আপন আপন ভাষাকেও আঁকড়ে থাকার উপায় নেই ছিটমহলে। শিখেছি, বাসা বটে এখানে কিন্ত বাড়ি যেখানে তা পরদেশ।"*[৩২]

তথ্যসূত্র :

১। দীপ্তেন্দু দাস, 'দেশ ভাগ-দেশত্যাগ : প্রসংগ উত্তরপূর্ব ভারত',পৃঃ১৯৫-১৯৬
২। রণবীর পুরকায়স্থ, 'সুরমা গাঙর পানি', কথার কথা অংশ
৩। দীপ্তেন্দু দাস, দেশ ভাগ-দেশত্যাগ : প্রসংগ উত্তরপূর্ব ভারত,পৃঃ১৯৫-১৯৬
৪। রণবীর পুরকায়স্থ, 'সুরমা গাঙর পানি',পৃঃ ১৩-১৪
৫। ঐ, পৃঃ ১৭
৬। ঐ, পৃঃ ৪০
৭। ঐ, পৃঃ ৪০
৮। ঐ, পৃ ৩৪৪

৯। ঐ, পৃ ১২
১০। ঐ, পৃ ১৬
১১। ঐ, পৃ ১৮
১২।ঐ, পৃ ১৮
১৩। ঐ, পৃ ২৬
১৪। ঐ, পৃ ৩৩
১৫। ঐ, পৃ ৩৩
১৬। ঐ, পৃ ৩৩
১৭। ঐ, পৃ ২৪১
১৮। ঐ, পৃ ১৩
১৯। ঐ, পৃ ৩১
২০। ঐ, পৃ ৫৭
২১। ঐ, পৃ ৫৭
২২।প্রদিপ সরকার 'দেশভাগ দেশত্যাগ প্রসংগ উত্তরপূর্ব ভারত' পৃ ২২৫
২৩। রণবীর পুরকায়স্থ 'সুরমা গাঙর পানি' পৃঃ ৬৪-৬৫
২৪।ঐ, পৃ ৭৫
২৫। ঐ, পৃ ৭৫
২৬। সমরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, 'স্বাধীনতা স্বাধীনতা', 'দেশভাগ দেশত্যাগ প্রসঙ্গ উত্তর পূর্ব ভারত', পৃঃ ৩০৬
২৭। রণবীর পুরকায়স্থ 'সুরমা গাঙর পানি' পৃঃ ২৬
২৮। ঐ, পৃ ৩৪২
২৯। ঐ, পৃ ৩৪৩
৩০। ঐ, পৃ ২৫৪
৩১। ঐ, পৃ ২৭৫
৩২। ঐ, পৃ, 'কথার কথা' অংশ

গ্রন্থপঞ্জী :

১। পুরকায়স্থ রণবীর, 'সুরমা গাঙর পানি', একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭৩, ২০১২
২। বর্মণ প্রসূন, সংকলক ও সম্পাদনা 'দেশভাগ-দেশত্যাগ প্রসঙ্গ উত্তরপূর্ব ভারত' ভিকি পাবলিশার্স, সরস্বতী অ্যাপার্টমেন্ট, ভাঙাগড়, গৌহাটী